কীর্তন: এক অপরুপ স্মৃতিসম্ভার

মখদুম আজম মাশরাফী

সম্প্রতি উদযাপিত হয়ে গেল জন্মাষ্টমী। হিন্দুধর্মানুসারীদের উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। জগতের দুষ্টদমনে সদা-সহযোগী আর পরাক্রম শক্তির আধার। এ প্রার্থনা-প্রশংসা-উৎসবের অন্যতম অংশ হল কীর্তন যপনাম।

কীর্তন যপনাম আমার বাল্যের স্মৃতি। বাংলা গানের বিচিত্র ধারায়ও কীর্তন একটি বিশিষ্ট ফল্গুপ্রবাহ। যখনই সুযোগ পাই এম পি ৩ এ প্রানভরে কীর্তন শুনি। প্রানের অন্তরলোকে ভক্তিমগ্ন সুস্থির সমীরন বয়ে আনে এই কীর্তনের সুর। সম্প্রতি ওয়েব পত্রিকায় জনৈকের কীর্তন স্মৃতিচারনা হঠাৎ আবার জাগিয়ে দিল আমার বাল্য-কৈশোরের অনুভূতির মৃদঙ্গ। যেন ছেলেবেলার সাথী দরোজায় এসে নাড়িয়ে দিল কড়াটি। ভাঁড়ারে আচমকা খুঁজে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রার মত ভরিয়ে দিল আমার স্মৃতিসুপ্ত মন সোনারঙের উদ্ভাসে।

এক সম্ভ্রান্ত আর ধর্মপ্রান মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। শৈশব-বাল্যের প্রকৃতি পরিবেশ স্বতঃতই পরিপূর্ন ছিল পরিব্যপ্ত আধ্যাত্ব-উদারতায়। সেই মুক্তাঙ্গনে দেবতুল্য পিতৃমাতৃ স্নেহে মানবমনের বৈচিত্রময় সুকুমার প্রবৃত্তিগুলির লালন-পরিচর্যা হয়েছে একান্ত বাগানবিলাসী হাতের সযত্ন পরশে। গ্রন্থিত ধর্মদর্শন অনায়াসে পরিব্যপ্ত হয়েছে মাটি ও মানুষের নিকট দৈনন্দিনতায়। যে শ্যামলবর্ণ গ্রামীন জীবনে কেটেছে আমার সুবর্ণ শৈশব কীর্তন তার এক বিরাট অংশ জুড়ে অপরুপ স্মৃতিসম্ভার হয়ে আছে। পৌষের কুয়াশা বিধুর সন্ধ্যার আগে সোনারোদের পরশ নিষ্প্রভ হয়ে এলে ধূপের স্বর্গীয় সৌরভে ভরে উঠতো কীর্তনের ভূবন। ঘেষুলাল আগরওয়ালা প্রায় প্রতি শীত মৌসুমে তাঁর ব্যবসা-আবাসের সুপরিসর অঙ্গনে ভক্তিসুষমায় সাজিয়ে তুলতেন কীর্তনের আয়োজন। প্রধান সড়ক সংলগ্ন সুউচ্চ ফটকের শীর্ষে উৎকীর্ন থাকতো, '....ঘোর অন্ধকারময় কলিযুগে একমাত্র বাঁচার পথ শ্রী শ্রী হরিনাম যজ্ঞ....।' নানান রঙিন আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো কীর্তনের পরিবেশ।

পরিশুদ্ধ আত্মিক আকর্ষনে প্রায় প্রতিরাতে চলে যেতাম কীর্তন মন্ডপে। এখনও স্পষ্ট অনুভব করতে পারি অপরিমেয় আনন্দ-উৎসবে ভরে উঠতো শ্রুতি, মন, দৃষ্টি ও বোধ। সে কি ছিল শুধুই এক জলসাময় সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক আনন্দময়তায় মগ্নতা, নাকি নিমগ্ন, নিমজ্জিত

আধ্যাত্মচেতনার সুগভীর সম্পৃক্ত অবগাহন? অনুধাবন করতে পারি বাল্য-শৈশবের আমার সেই সম্পৃক্তি এই মধ্যবয়সের চেতনায় জ্বালিয়ে রাখে বিশ্ববিধাতার প্রতি ভক্তির অম্লান মোমের নরম আলো।

রাতের খাওয়া সেরে ক'জন হিন্দু-মুসলমান বন্ধু মিলে চলে যেতাম কীর্তন খোলায়। ততক্ষনে প্যান্ডেল প্রায় পূর্ণ। একবারে মাঝখানে দেড়মানুষ সমান উচ্চতার একটি ক্ষুদ্র মন্দির আকৃতির চৌকোন কাঠের তৈরী মন্ডপ। সেটির চারধারে ঘিরে কীর্তন নৃত্যের স্থান। ভক্তদের থেকে পৃথক করা বাঁশের তৈরী ঘেরা দিয়ে। ঘেরার চারিধার ঘিরে ভুমিতে পাতানো ফরাসে উপবিষ্ট দর্শক-শ্রোতাবৃন্দের মধ্য দিয়ে দুরের গ্রীনরুমের মত একটি ঘেরা থেকে কীর্তন দলেন মঞ্চে আসার জন্য লম্বা, সরু একটি পথ ড়্গাঁশের ঘেরা দিয়ে আলাদা করা।

শুরু থেকে অবিরত ৮ দিন ৮ রাত চলতো এই কীর্তন। একটি সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রমন আর অন্যটির প্রবেশ এভাবে চলতো দিবারাত্রি। একদিকে বসতেন মহিলারা আরেকদিকে বসতেন অন্য সবাই। একবারে সামনে বসে কীর্তন শোনার চেয়ে পেছনে অথবা মাঝামাঝি বসে কীর্তন শুনতেই বেশী পছন্দ করতাম। কারন এতে করে পুরো পরিবেশটিতে নিজেদের যথাযথভাবে স্থাপন করা সম্ভব হত। আমরা ক্রমে হয়ে উঠতাম এই অপরুপ ভক্তি-আনন্দের অখন্ড অংশ।

গ্রীন রুম থেকে বেজে উঠতো সমবেত যন্ত্রঝংকার। খোল-তাল, ঠুমরি-মন্দিরা আর হারমোনিয়মের সমন্বিত এক বিশেষ সুর-লয়ে কীর্তনীয়ারা ছন্দময় ব্রজে মঞ্চের দিকে যাত্রা করতেন। মঞ্চের সম্প্রদায়ও কিছুটা উচ্চগ্রামে প্রতিউত্তর ঝংকার তুলে নিষ্ক্রমন বারতা জানাতেন ভক্তদের। এ সময়টি হয়ে উঠতো বেশ চঞ্চল। প্রতি দলের মধ্যে থাকতো নারী পূরুষ মিলিয়ে ৮ থেকে ১০ জন। গেরুয়া বসন, শুভ্র অথবা হলুদাভ ধুতি-পাঞ্জাবী পরতের পূরুষেরা। মহিলারা পরতেন সেরকম রঙের শাড়ী। সবার কপাল থেকে নাশিকা অবধি আঁকা থাকতো বিশেষ বৈশিষ্টে চর্চিত চন্দনের তিলকরেখা। পূরুষ ও নারী উভয়েরই চুল কখনও বাঁধা থাকতো শীবের অনুকরনে চুড়ো করে আবার কখনও এরা থাকতেন নেহায়েত এলোকেশী। চুলের চুড়োয় কখনও জড়ানো থাকতো হলুদ ফুলের মালা। গলায়ও থাকতো কোমর অবধি দীর্ঘ ফুলের অথবা শোলার মালা। প্রার্থনাস্থানে নগ্নপদেই বিচরন ছিল সবার। কোন কোন কীর্তনীয়ার পায়ে কখনও নূপুরও বাঁধতে দেখেছি। এদের প্রায় সবারই ছিল সুললিত কণ্ঠ। কীর্তনীয়াদের বয়সের বৈচিত্র কণ্ঠের লালিত্যে আনতো বিচিত্র স্বরগ্রাম। এ পরিবেশনায় ব্যক্তি অস্তিত্ব একাকার হয়ে গড়ে তুলতো সমন্বিত একটি সমবেত সৌন্দর্য্য।

সম্প্রদায়ের আসা যাওয়ার পথের দু'পাশে ভক্তদের উচ্ছসিত আবেগ উছলে পড়লে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়তেন। পুষ্পবৃষ্টি হত আর মহিলারা তুলতেন তুমুল, অস্থির আর আপ্লুত উলুধ্বনি। এই সম্পৃক্তি আন্তরিক ভক্তি প্রসূত না পারিবেশিক দ্যোতনায় আপ্লুত প্রতিক্রিয়া তা অনুধাবন করা সহজ ছিল না। আমার নিজ অনুভূতির অর্থ নিরুপন আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তবে এ কথা বলতে পারি, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক অন্বেষনে মানুষের আত্মমগ্নতার মধ্যে ভক্তি ও প্রার্থনার বিচিত্র রুপ এক অনিঃশেষ যাত্রার নাম।

প্রসাদ ও মিষ্টান্নের অংশটুকুও ছিল এই পুরো পটভূমির অখন্ড অংশ। সে ভোজনের মধ্যে ছিল অগতানুগতিক স্বাদ, ঘ্রান আর সৌন্দর্য্য। সেই উৎসব মুগ্ধতার পরিবেশে সে খাবার হয়ে উঠতো অত্যন্ত আকর্ষনীয়। ধবধবে শাদা কাগজের মত লুচি, সুস্বাদু ডাল-তরকারী-ভাজি, আতপ চাল-কলা, ফলার, ক্ষীর, পায়েশ, নানান রকমের, সন্দেশ-মিষ্টি আরও কতকিছু।

সুদর্শন-সুদর্শনা কীর্তনীয়াদের দেবদূত মনে না হলেও নিবেদিত পবিত্র সৌন্দর্য্যেও প্রতিরুপ বলে মনে হত। বেশ পুরু করে এরা প্রসাধন করতেন। মোটা কাজলরেখায় চোখ হয়ে উঠতো বড় বড়, টানা টানা। এদের কণ্ঠলালিত্য, দেহভঙ্গী, নিবেদিত পদচারনা ও নৃত্য ভরিয়ে তুলতো ভক্তদের দৃষ্টি ও মন। যখন এরা দু'হাত তুলে সমন্বিত যন্ত্রঝংকারের সাথে সমবেত কণ্ঠে যপনাম করতেন,..'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হরে হরে.... ' তখন এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি হত।কীর্তনীয়ারা নাচতে নাচতে কখনও সাষ্ঠাঙ্গে প্রনাম করতেন কোন কোন মগ্ন ভক্তকে। । আবার ভক্তও ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রনাম করতেন কীর্তনীয়াদের বোল হরি, হরিবোল বলতে বলতে।

ভোর রাতে ঢুলু ঢুলু চোখে বাড়ী ফিরতাম। কিছুক্ষন ঘুমিয়ে ছুটতাম স্কুলে । ঘুমহীনতা বড় কষ্ট। স্কুল থেকে ফিরে বড্ড ঘুম পেতো। ঘুমিয়ে পড়তাম ফের। নেশাপ্রাপ্তজনের মত রাতে আবার গিয়ে হাজির হতাম কীর্তনখোলায়।

ভক্তির সুর যেন মানুষের সংস্কৃতিতে সবার অলক্ষ্যে নাড়ীর রক্তপ্রবাহের মত সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তাইতো কীর্তন ধূপ-মন্ডপের সীমানা উপচে জীবন সংগ্রামের যাচিত রসনা সিঞ্চিত করে তোলে। সত্তরের দশকে বাঙালির আত্মপ্রত্যয়ের সেই প্রতিবাদী দিনগুলিতে কীর্তন তাই সুর দেয় সংগ্রামমুখর সময়কে। গণসঙ্গীতে যুক্ত হয় প্রহসনের ভাষা,....' ষাট টাকায় চাল খেয়ে স্বর্গে যাবো গো, চালের বদল ভুট্টা খেয়ে স্বর্গে যাবো গো,মোরা গামছা গলায়..নাগরও দোলায় স্বর্গে যাবো গো... সখি হে.....।' ষাটের দশকে সন্তোষে আয়োজিত সমাবেশে মওলানা ভাষানী তার আমন্ত্রিত অতিথি তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়কে কীর্তন সম্পর্কে বলা একটি উক্তি স্বরনযোগ্য, "হিন্দুরা সব চলে যাওয়ায় আর ভজন-কীর্তন, গান-বাজনা হয় না। সন্ধ্যাবেলা চারিদিক নিরানন্দ। আবার কি সেই সব দিন ফিরে আসবে?.." (অন্নদাশংকর রায়, মুক্তবাংলার স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৬৫.)। কীর্তন ১৯ প্রকারেরও বেশী বাংলাগানের বিচিত্র ধারার মধ্যে অন্যতম।

আমার কীর্তনের যত স্মৃতি তা পাকিস্তান আমলের। সে কাল আর ঘেষুলাল আগরওয়ালারা আর নেই। তাঁর উত্তরসূরীরা এখন ইন্টারনেট ক্যাফে আর ফোন বুথের ব্যবসা করছে। সে ব্যবসালয়ে এখনও আছে বিশাল বিশাল দেব-দেবীর ছবি আর হনুমানদেবের ছবি। শুধু নেই ভক্তিপূর্ণ প্রশান্ত মনের মানুষ আর আধ্যাত্ম সুর ও সংস্কৃতি মনস্ক সেই গনযুক্ত পরিবেশ।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, ২৬ জুন ২০০৬

লেখক পরিচিতি দেখতে এখানে টোকা মারুন